যুগান্তর

তারিখ 26 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ঘিরে চলছে কোচিং ও গাইডের রমরমা ব্যবসা

কোচিংয়ের প্রবণতা বেড়েছে শিক্ষার্থীদের

মুসতাক আহমদ

ফয়জুল ইসলাম পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার দাসপাড়া খাজুরবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ফয়জুলের বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তার বাবার মাসিক আয় সর্বশাকুল্যে ৮-১০ হাজার টাকা। কিন্তু এই দুর্মূল্যের বাজারে সে দুটি বিষয়ে কোচিং পড়ে। এখানেই শেষ নয়, সে দুটি কোম্পানির গাইড বই কিনেছে। এর বাইরে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার জন্য প্রকাশিত একটি কোম্পানির বিশেষ গাইডও কিনেছে। ফয়জুল জানায়, সৃজনশীল পদ্ধতির 'বলি' নমুনা-প্রশ্ন পাওয়া ও বোঝার জন্য তাকে টন সেট গাইড কিনতে হয়েছে। এরপরও সে স্পষ্ট বছরই দুটি বিষয়ে কোচিং করে থাকে।

শুধু ফয়জুল নয়, রাজধানী থেকে শুরু করে প্রায় সারাদেশেই এভাবে ছাত্রছাত্রীদের কোচিংমুখিনতা ও একাধিক গাইড বই কেনার প্রবণতা বেড়েছে। বিশেষ করে ঢাকাসহ বড় বড় শহরের ব্যবসা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ব্যবসা : রমরমা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নামকরা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ প্রবণতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিংয়ের রমরমা বাজার থাকলেও এখন তা একাডেমিক কোচিংয়ের কাছে মার খেয়েছে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মহাশয় শিক্ষকের বাসিকানা বা ছাত্রছাত্রীর ব্যয়ের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ওইসব কোচিং সেন্টার। রাজধানীর ডিকাতনিশা নূর স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মনিপুর স্কুল ও কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজ, ফজলুর রহমান আইডিয়াল ইন্সটিটিউট, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন নামকরা স্কুলের অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপে জানা গেছে, অনেকেই স্কুলের শিক্ষকদের কাছে কোচিং করে। কেউ শিক্ষকের বাসায় আবার কেউ বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারে। স্কুলের শিক্ষকরা বলে দেন কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে হবে। মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক যুগান্তরকে জানিয়েছেন, ওই প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে আশপাশে অন্তত একশ' কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। যার বেশির ভাগের মালিক প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে স্কুলটির শিক্ষকরা। আর প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে বেইলি রোড এবং মতিঝিলের কলেজপাড়া ও শাহজাহানপুর এলাকায় গেলে তো রীতিমতো কোচিংমুখী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মিছিল দেখা যায়। আজিমপুর কবরস্থানের সামনে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে রায়হান স্কুল ও কলেজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাম দেয়া হলেও সেখানকার মূল ব্যবসা কোচিং। 'প্রত্যাশা' নামে একটি কোচিংয়ে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের ভিড় দেখা যায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। এভাবে রাজধানীতে উদ্যাস, ই হক, লাইসিয়ামসহ নানা নামে কোচিং সেন্টারের বাইরে ব্যক্তির নামে হাজার হাজার কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। দেয়ালদিশন, বিদ্যুতের খুঁটিতে ফেস্টুন, ব্যানার এমনকি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ডিশ কানেকশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রের অভিভাবক নাম প্রকাশ না করে জানান, তার ছেলে সকালে স্কুল শুরুর আগে একটি ও দুপুরের পর দুটি কোচিং করে। সংশ্লিষ্টরা জানান, কোচিং ব্যবসা মহামারীর আকার ধারণ করেছে। একশ্রেণীর নীতিহীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হয় ফুসলিয়ে আকৃষ্ট করে নতুবা বাধ্য করে কোচিং পড়তে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকের কাছে কোচিং না করলে ক্লাসরুমে ধাঁচ করিয়ে কাটুকি, অপমান করা, পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দেয়া, ডায়েরিতে বাজে মন্তব্য করা, বাজে ব্যবহার করাসহ নানাভাবে শিক্ষার্থীদের নাজেহাল করা হয়ে থাকে। আর সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির কারণে এ ব্যবসার বাজার এখন মারাত্মক চড়া।

শিক্ষার্থীরা দেদারসে গাইড কিনছে : সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গাইড বইয়ের বিক্রি বন্ধ। নোট-গাইড শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের পথের অন্তরায়। নোট-গাইড পড়লে শিক্ষার্থী চিন্তাশীল ও সৃজনশীল হয় না। এ কারণেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট ও গাইড বই প্রকাশ এবং বিক্রি আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিয়ে মামলাও হয়েছে। মামলায় সরকারই জিতেছে। কিন্তু এরপরও দেশে তা প্রকাশ, পরিবহন, বিপণন হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই গাইড বই কিনে থাকে। আর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ একাধিক গাইড কিনছে। রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী প্রমি (ছদ্মনাম) জানায়, তার কাছে দুই সেট গাইড রয়েছে। আর ডিকাতনিশার নবম শ্রেণীর অন্তরে ছাত্রী জানায়, সে তিনটি কোম্পানির গাইড কিনেছে। এভাবে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে বেশি গাইড বই কিনছে। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির কারণেই মূলত এ অবস্থা। পটুয়াখালীর ফয়জুল ইসলাম জানায়, সৃজনশীল পদ্ধতির চারটি ধাপের প্রশ্নের মধ্যে প্রথম দুটির উত্তরের জন্য তাদের গাইড বইয়ের দ্বারস্থ হতে হয়। বাকি দুটি প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের ভেতর থেকেই বের করা যায়। এক প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, প্রথম দুটি অংশের প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রে মূল বইয়ের বাইরে থেকে হয়ে থাকে, যা তাদের জানতে গাইড বই সহায়তা করে।

বছরে দেড় হাজার কোটি টাকার গাইড : বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (এসইএসডিপি) যৌথ নিয়ে জানা গেছে, সারাদেশে বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ১ কোটি ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এসব ছাত্রছাত্রীর অন্তত কমপক্ষে দুটি করে সেট গাইড বই কিনছে। এ হিসাবে বছরে অন্তত দেড় হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য চলে এই সেক্টরে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এই গাইড বইয়ের ব্যাপারে রহস্যজনক কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে এনসিটিবি, মাঠপর্যায়ের প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণে প্রকাশ্যে গাইড বই প্রকাশ, পরিবহন ও বিক্রি হলেও তা নিরাপদই থাকছে। শুধু তাই নয়, অনেক সমালোচনার পর চলতি বছরের শুরুতে ঢাকা জেলা প্রশাসনকে এনসিটিবি থেকে গাইডের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়। সে অনুযায়ী ঢাকা জেলা প্রশাসন ১৫টি কমিটিও গঠন করে ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন টিমই অভিযান চালায়নি বলে জানা গেছে।

কেন এই কোচিং আর গাইড ব্যবসা : সারাদেশে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা আর কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক রয়েছেন প্রায় ৫ লাখ। এসইএসডিপি সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়ন প্রকল্পের পরিচালক রতন রায়ের দাবি, তারা এ পর্যন্ত সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে মাদ্রাসা আর কলেজ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি খুবই হতাশাজনক বলে জানা গেছে। তবুও দিকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলোতে পাঠদান ব্যাহত হতো। পরবর্তীকালে মাধ্যমিকে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়লেও ক্লাসে প্রয়োজনীয় পাঠদান না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু নিয়ে ধাঁধা লেগেই থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা পড়া বোঝার জন্য শিক্ষকের বাসায় বা কোচিং সেন্টারে দৌড়াচ্ছে। আবার যাদের এই কোচিং নেয়ার সামর্থ্য নেই, তাদের অনেকে একাধিক গাইড বই কিনে ভর্তি পোষানোর চেষ্টা চালায়। এভাবেই ক্লাসে ঠিকমতো পাঠদান না হওয়া বা বোঝার অভাবে শিক্ষার্থীরা কোচিং বা গাইড বইয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

গাইড নয় রেফারেন্স বুক : দেশে গাইড বই বিক্রিতে শীর্ষস্থানীয় ও নামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে লেকচার, পাঞ্জেরি, ভূপিটার, অনুপম, প্যাসাপ্রি। এছাড়া আরও ১৫ থেকে ২০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা নোট-গাইড বই প্রকাশ করে থাকে। জানা গেছে, কাটতির দিক থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভূপিটার বাজারের বড় একটি অংশ দখল করে আছে। লেকচার মাধ্যমিক বিশেষ করে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর বাজার বেশি দখল করে রেখেছে। পাঞ্জেরিরও একই অবস্থা। তবে এই তিনটির সঙ্গে অন্যগুলোর প্রতিযোগিতার কোন তুলনা হয় না। যুগান্তরের পক্ষ থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এছাড়া প্রকাশক ও স্কুল সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলাপ করা হয়। তারা জানিয়েছেন, তাদের প্রকাশিত বইয়ের বিক্রি ভালো। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং আগের চেয়ে বেশি। তবে তারা কেউই তাদের প্রকাশিত বইকে গাইড বা নোট বলতে নারাজ। তারা বলেছেন, তারা 'রেফারেন্স বুক' প্রকাশ করে থাকেন। আর এটা সারা পৃথিবীতেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটা নিষিদ্ধও নয়। পাঞ্জেরি অন্যতম পরিচালক আমরুল হাসান শায়ক জানান, তারা কোন গাইড বই প্রকাশ করছেন না, তারা শিক্ষার্থীদের হাতে রেফারেন্স বই তুলে দিচ্ছেন। গাইডের সংজ্ঞা হলো মূল পাঠ্যবইয়ে অনুশীলনী থাকলে তার উত্তর সমাধান করা। কিন্তু তারা যা করছেন তা কেবলই মূল পাঠকে বোধগম্য করার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক পাঠালোচনা। এটা প্রকৃতপক্ষে প্লেন থেকে শুরু করে বিদেশের বহু নামিদামি প্রকাশনা সংস্থাও অহরহ করে থাকে। লেকচার গাইডের প্রধান নির্বাহী শরীফ উল আলম জানান, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কোন প্রকাশকই গাইড প্রকাশ করছেন না। বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় থেকে তাদের প্রকাশনা জব্দকে নানাভাবে 'ডিস্টার্ব' করা হচ্ছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জরিমানা পর্যন্ত আদায় বসছে। এ ব্যাপারে সরকারের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ভূপিটারের কর্মকর্তা কাজসার-ই আলম প্রধান বলেন, তারা যদি গাইড বই প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু কোন গাইড বা নোট বই প্রকাশ করছেন না তারা। আর প্যাসাপ্রি প্রকাশনীর মালিক ও পুস্তক প্রকাশক সমিতির সহসভাপতি শব গোলাম কবীর বলেন, সাদা চোখে দেখলে দেখা যাবে, শহরাঞ্চলের স্কুলগুলো ছাড়া দেশের বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের যোগ্যতা আর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সে অবস্থায় এমনি ধরনের রেফারেন্স বইয়ের মাধ্যমে বরং শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয় পক্ষই উপকৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্কুল শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকম শাহ আলম জানান, এক সময় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড প্রকাশনা নিষিদ্ধ ছিল সত্য। কিন্তু এখন যেহেতু কেউই এই গাইড প্রকাশ করেন না, তাই এ ব্যাপারে কারও তৎপরতাই কাম্য নয়। তিনি বলেন, সরকারের উচিত এমন রেফারেন্স বুক নিয়ে নতুন আইন করা, যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হয়। বিশেষ করে দেশ লাভবান হয়।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : সার্বিক ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, নোট-গাইডের ওপর নির্ভরতা থাকবে না— এই যে লক্ষ্য নিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে তারা এখনও সেই ধারণার ওপরই আছেন। অন্যের চেয়ে গাইড বিক্রি বাড়ল না কমল, এটা মূল্যায়নের চেয়ে আগামী ৩-৪ বছর পর কি ঘটে তার জন্য সবার অপেক্ষা করা উচিত। তিনি বলেন, যখন পরীক্ষার্থী আর অভিভাবকরা দেখবেন যে, গাইড থেকে কমন পড়ে না, তখন কেউ আর তা কিনবে না। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ক্লাসে পাঠদান নিশ্চিতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। কোচিং বন্ধে নীতিমালা হচ্ছে। শিগগিরই এর সুফল পাবে জনগণ। এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক রতন রায় বলেন, আগামী ৪-৫ বছর পর কেউই আর নোট-গাইড কিনবে না। জনগণকে অন্তত সে ক'টি বছর তাদের সুযোগ দিতে হবে। তিনি বলেন, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বাস্তবায়নে গাইড মাফিয়ারা বা গাইড সহায়তা করছে— এমনি দাবি ভুয়া। সরকারই এ ব্যাপারে সফল বাস্তবায়ন করে তার সুফল পেয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানান, সৃজনশীল পদ্ধতিতে এক হাজার বছরেও একটি প্রশ্নও রিপিট হবে না, গাইড থেকে কমন পড়া তো দূরের কথা। সুতরাং মানুষ যখন দেখবে যে, গাইড বিনে লাভ নেই, তখন তারা এমনিতেই তা বর্জন করবে। তিনি বলেন, অনেকে প্রথম প্রথম মনে করছে, গাইড তাদের সহায়তা করবে কিন্তু তা নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোচিং আর গাইডনির্ভরতা কমাতে তারা আরও তৎপর হবেন। এ ব্যাপারে বিকল্প ভাবা হবে।